মনীষীদের জীবনী

সুকুমার রায়

মনীষীদের জীবনী

সুকুমার রায়

বই পরিকল্পনায় : গ্রন্থিক প্রকাশন
মুদ্রণ : গ্রন্থিক মিডিয়া (প্রিন্টিং প্যাকেজার)

অজানা দেশে

সেদিন একটা বইয়ে মাঙ্গো পার্কের কথা পড়ছিলাম। প্রায় সওয়া শ বৎসর আগে অর্থাৎ লিভিংস্টোনের অনেক পূর্বে মাঙ্গো পার্ক আফ্রিকার অজানা দেশ দেখতে গিয়েছিলেন। এক—একজন মানুষের মনে কেমন নেশা থাকে, নূতন দেশ নূতন জায়গার কথা শুনলে তারা সেখানে ছুটে যেতে চায়। তারা অসুবিধার কথা ভাবে না, বিপদ-আপদের হিসাব করে না—একবার সংযোগ পেলেই হয়। মাঙ্গো পার্ক এই- রকমের লোক ছিলেন। তাঁর বয়স যখন ২৪ বৎসর মাত্র, তখন তিনি নাইগার নদীর সন্ধান করতে গিয়েছিলেন। তার কিছু দিন আগে একজন ইংরাজ সেই অজানা দেশে ডাকাতের হাতে মারা যান–অথচ পার্ক তা জেনেও মাত্র দুজন সে-দেশী চাকর সঙ্গে সেই পথেই বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর উদ্দেশ্য সেই নদী ধরে ধরে তিনি আফ্রিকার ঐ অঞ্চলটা বেশ করে ঘুরে আসবেন। তখনও আফ্রিকার ম্যাপে সেইসব জায়গায় বড় বড় ফাঁক দেখা যেত আর সেগুলোকে 'অজানা দেশ' বলে লেখা হত।

সে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সে সময়ে অনেকটা আরব ও মূর জাতীয় মুসলমানদের হাতে ছিল। ইউরোপীয় লোক সেখানে গিয়ে পাছে তাদের ব্যবসা কেড়ে নেয়, এই ভয়ে সাহেব দেখলেই তারা নানারকম উৎপাত লাগিয়ে দিত। পার্ককেও তারা কম জ্বালাতন করেনি; কতবার তাঁকে ধরে বন্দী করে রেখেছে—তাঁর সঙ্গের জিনিস-পত্র কেড়ে নিয়েছে—তাঁর লোকজনকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে এমনকি তাঁকে মেরে ফেলবার জন্যও অনেকবার চেষ্টা করেছে। তার উপর সে দেশের অসহ্য গরম আর নানা-রকম রোগের উৎপাতেও তাঁকে কম ভুগতে হয়নি। একবার জলের অভাবে তাঁর এত কষ্ট হয়েছিল যে, তিনি গাছের পাতা শিকড় ডাঁটা চিবিয়ে তৃষ্ণা দূর করতে চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু তাতে কি তৃষ্ণা যায়? সারাদিন পাগলের

মতো জল খুঁজে খুঁজে, সন্ধ্যার কিছু আগে ঘোড়া থেকে নামতে গিয়ে, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তারপর যখন তাঁর জ্ঞান হল তখন তিনি চেয়ে দেখেন, ঘোড়াটা তখন তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে সূর্য অস্ত গেছে, চারিদিক ক্রমেই অন্ধকার হয়ে আসছে, কাজেই আবার তাঁকে ঘোড়ায় চড়ে জলের সন্ধানে বেরোতে হল। তারপর যখন তাঁর দেহে আর শক্তি নাই, মনে হল প্রাণ বুঝি যায় যায়, তখন হঠাৎ উত্তরদিকে বিদ্যুৎ চমকিয়ে উঠল। তা দেখে তাঁর আবার উৎসাহ ফিরে এল, তিনি বৃষ্টির আশায় সেইদিকে চলতে লাগলেন । চলতে চলতে ক্রমে ঠাণ্ডা বোধ হতে লাগল, বাদলা হাওয়া দেখা দিল, তারপর কড়কড় করে বাজ পড়ে ঝমাঝম বৃষ্টি নামল। পার্ক তখন তাঁর সমস্ত কাপড় বৃষ্টিতে ধরে দিয়ে, সেই ভিজা কাপড় নিংড়িয়ে তার জল খেয়ে তৃষ্ণা দূর করলেন। তখন ঘুট ঘুটে অন্ধকার রাত্রি, বিদ্যুতের আলোতে কম্পাস দেখে দিক স্থির করে, আবার তাঁকে সারারাত চলতে হল।

একবার তিনি সারাদিন না খেয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে এক সহরে গিয়ে হাজির হতেই, সেখানকার রাজা হকুম দিলেন, 'তুমি গ্রামে ঢুকতে পারবে না।' তিনি সেখান থেকে অন্য এক গ্রামে গেলেন, সেখানেও লোকেরা তাঁকে দেখে ভয়ে পালাতে লাগল—তিনি যে বাড়িতেই যান লোকে দরজা বন্ধ করে দেয়। শেষটায় হতাশ হয়ে তিনি একটা গাছের তলায় বসে পড়লেন। এইরকম অনেকক্ষণ বসে থাকবার পর, একটি নিগ্রো স্ত্রীলোক আর তার মেয়ে এসে তাঁকে ডেকে তাদের বাড়িতে নিয়ে খেতে আর বিশ্রাম করতে দিল। সে-দেশীয় মেয়েরা সন্ধ্যার পর ঘরে বসে চরকায় সুতো কাটে আর গান গায়। মাঙ্গো পার্কের নামে তারা গান বানিয়ে গেয়েছিল—সেই গানটার অর্থ এই—'ঝড় বইছে আর বৃষ্টি পড়ছে, আর বেচারা সাদা লোকটি শ্রান্ত অবশ হয়ে আমাদের গাছতলায় এসে বসেছে। ওর মা নেই, ওকে দুধ এনে দেবে কে? ওর স্ত্রী নেই, ওকে ময়দা পিষে দেবে কে? আহা, ঐ সাদা লোকটিকে দয়া কর। ওর যে মা নেই, ওর যে কেউ নেই।'

তিনি অনেকবার 'মূর'দের হাতে পড়েছিলেন। এক একটা গ্রামে তিনি যান আর সেখানকার সর্দার তাঁকে ডেকে পাঠায়, নাহয় লোক দিয়ে ধরপাকড় করে নিয়ে যায়। এইরকম অবস্থায় তারা তাঁর কাছ থেকে, প্রায়ই কিছু না কিছু বকশিস আদায় না করে ছাড়ত না। এমনি করে তাঁর সঙ্গের জিনিসপত্র প্রায় সবই বিলিয়ে দিতে হয়েছিল। একবার এক সর্দার তাঁর ছাতাটি তাঁর কাছ থেকে আদায় করে মহা খুশী! ছাতাটাকে সে ফট ফট করে খোলে

আর বন্ধ করে; আর হো হো করে হাসে। কিন্তু ওটা দিয়ে কি কাজ হয়, সে কথাটা বুঝতে তার নাকি অনেকখানি সময় লেগেছিল। আসবার সময় মাঙ্গো পার্কের নীল কোট আর তাতে সোনালী বোতাম দেখে, সর্দার মশাই কোটটাও চেয়ে বসলেন। তখন সেটা তাকে না দিয়ে আর উপায় কি? যাহোক, সর্দারের মেজাজ ভাল বলতে হবে, সে ছাতা আর কোটের বদলে তাঁকে অনেক জিনিসপত্র সঙ্গে দিয়ে, তাঁর চলাফিরার সুবিধা করে দিল। কিন্তু সকল সময়ে তিনি এত সহজে পার পাননি। আলি নামে এক মূর রাজার দল তাঁকে বন্দী করে, মাসখানেক খুব অত্যাচার করেছিল। প্রথমটা তারা ঠিক করল যে, এই বিধর্মী খৃষ্টানকে মেরে ফেলাই ভাল। তারপর কি যেন ভেবে তারা আবার বলল, 'ওর ঐ বেড়ালের মতো চোখ দুটো গেলে দেও।' যাহোক শেষটায় সেখানকার রানীর অনুগ্রহে তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন।

এমনি করে অত্যাচার অপমান চুরি ডাকাতি সব সহ্য করে, মাঙ্গো পার্ক শেষটায় একেবারে ফকির হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর লোকজন কাপড়চোপড় জিনিসপত্র, এমনকি ঘোড়াটি পর্যন্ত সঙ্গে রইল না। কিন্তু এত কষ্ট সয়েও শেষটায় যখন তিনি নাইগার নদীর সন্ধান পেলেন, তখন তাঁর মনে হল এত কষ্ট এত পরিশ্রম সব সার্থক হয়েছে। এমনি করে তিনি দুই বৎসর সে দেশ ঘুরে, তারপর দেশে ফিরে আসেন। এই দুই বৎসরের সব ঘটনা তিনি প্রতিদিন লিখে রাখতেন। আমরা এখানে যা লিখছি তার প্রায় সবই তাঁর সেই ডায়ারি থেকে নেওয়া।

আফ্রিকার নিগ্রো জাতীয় লোকদের আমরা সাধারণত 'অসভ্য জাতি' বলে থাকি—কিন্তু মাঙ্গো পার্ক বলেন যে, মূর বা আরব জাতীয় লোকেদের মধ্যে যারা কতকটা 'সভ্য' হয়েছে, তাদের চাইতে এই অসভ্যেরা অনেক ভাল। আমাদের দেশে যেমন সাঁওতালরা প্রায়ই খুব সরল আর সত্যবাদী হয়, মোটের উপর এরাও তেমনি। তাদের দেশে তারা বিদেশী লোক দেখেনি কাজেই হঠাৎ অদ্ভুত পোশাক পরা হলদে চুল নীল চোখ সাদা রঙের মানুষ দেখলে তাদের ভয় হবারই কথা। কিন্তু তবু বিপদ-আপদে পার্ক তাদের কাছেই সাহায্য পেতেন, মূর বা আরবদের কাছে নয়।

দেশের নানান স্থানে নানান জাতীয় লোক, তাদের মধ্যে সর্বদাই, যদ্ধ-বিগ্রহ চলে। একবার মাঙ্গো পার্ক মালাকোন্ডা বলে একটা সহরে এসে শুনলেন, আরও উত্তরে খুব বড় একটা লড়াই চলছে—'ফুতা তরা'র রাজা আব্দুল কাদের অসভ্য জালফদের রাজা দামেলকে আক্রমণ করেছেন। এই আবুল

কাদের আর দামেলের যুদ্ধ বড় চমৎকার। আব্দুল কাদের একজন দূতকে দিয়ে দামেলের কাছে দুখানা ছবি পাঠিয়ে দিলেন, আর বলে দিলেন— 'দামেল যদি মুসলমান হতে রাজি হন, তবে এই ছবি দিয়ে আবুল কাদের নিজের হাতে তাঁর মাথা কামিয়ে দিবেন, আর যদি রাজি না হন তবে ঐ ছুরিটি দিয়ে তাঁর গলা কাটা হবে। এর মধ্যে কোনটি তাঁর পছন্দ?' দামেল একথা শুনে বললেন, 'কোনটাই পছন্দ হচ্ছে না। আমি মাথাও কামাতে চাই না, গলায় ছুরিও বসাতে চাই না।' আবুল কাদের তখন প্রকাণ্ড দলবল সঙ্গে নিয়ে, জালফদের দেশে লড়াই করতে এলেন। জালফদের অত সৈন্য-সামন্ত নেই, তারা নিজেদের ঘর বাড়ি পাড়িয়ে, পথের পাতকুয়া সব বন্ধ করে, সহর গ্রাম সব ছেড়ে পালাতে লাগল। এমনি করে তিনদিন পর্যন্ত আবুল কাদের ক্রমাগত এগিয়েও লড়াইয়ের কোন সংযোগ পেলেন না। তিনি যতই এগিয়ে চলেন, কেবল নষ্ট গ্রাম আর পোড়া সহরই দেখেন, কোথাও জল নাই খাবার কিছু নাই, লুটপাট করবার মতো কোন জিনিসপত্র নাই। চতুর্থ দিনে তিনি পথ বদলিয়ে সারাদিন হেঁটে একটা জলা জায়গার কাছে এলেন। সেখানে কোনরকমে তৃষ্ণা দূর করে ক্লান্ত হয়ে সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে, এমন সময় ভোর রাত্রে দামেল তাঁর দলবল নিয়ে, মারমার করে তাদের উপরে এসে পড়লেন। আবুল কাদেরের দল সে চোট আর সামলাতে পারল না— তাদের কেউ কেউ পালিয়ে গেল, অনেকে মারা পড়ল, কিন্তু অধিকাংশই জালফদের হাতে বন্দী হল— সেই বন্দীদের একজন হচ্ছেন আবুল কাদের নিজে। জালফরা মহা ফুর্তিতে আবুল কাদেরকে বেঁধে দামেলের কাছে নিয়ে গেল। সকলে ভাবল এইবার দামেল বুঝি তাঁর বুকে ছুরি মেরে তাঁর শত্রু তার প্রতিশোধ নেবেন। কিন্তু দামেল সেরকম কিছুই না করে, জিজ্ঞাসা করলেন, 'আবুল কাদের, তুমি যথার্থ বল ত— আজ তুমি বন্দী না হয়ে যদি আমি বন্দী হতাম, আর তোমার কাছে আমায় নিয়ে যেত, তাহলে তুমি কি করতে? আবুল কাদের বললেন, 'তোমার বুকে আমার বল্লম বসিয়ে দিতাম। তুমি তার বেশি আর কি করবে?' দামেল বললেন, 'তা নয়! তোমায় মেরে আমার লাভ কি? আমার এইসব নষ্ট ঘরবাড়ি কি আর তাতে ভাল হয়ে যাবে, আমার প্রজারা কতজনে মারা পড়েছে— তারা কি আবার বেঁচে উঠবে তোমায় আমি মারব না। তুমি রাজা, কিন্তু রাজার ধর্ম থেকে তুমি পতিত হয়েছ। যতদিন তোমার সে দুর্মতি দূর না হয়, ততদিন তুমি রাজত্ব করবার যোগ্য হবে না— ততদিন তুমি আমার দাসত্ব করবে।' এইভাবে তিনমাস

নিজের বাড়িতে বন্দী করে রেখে তারপর তিনি আবুল কাদেরকে ছেড়ে দিলেন। এখনও নাকি সে দেশের লোকেরা দামালের এই আশ্চর্য মহত্ত্বের কথা বলে গান করে।

নাইগার নদীর আশেপাশে যেসব নিগ্রোরা থাকে তাদের 'মাণ্ডিঙ্গো' বলে। তাদের সম্বন্ধে পার্ক অনেক খবর সংগ্রহ করেছেন। তারা মনে করে, এই পৃথিবীটা একটা প্রকাণ্ড সমতল মাঠের মতো; তার শেষ কোথায় কেউ জানতে পারে না, কারণ তার চারিদিক মেঘে ঘেরা। তারা বছরের হিসাব দেয় বড় বড় ঘটনার নাম করে, যেমন 'কুরবানা যুদ্ধের বছর', 'দামেলের বীরত্বের বছর'। পার্ক যে-সকল গ্রামে গিয়েছিলেন, তার কোন কোনটিতে সেই বছরকে বলা হত 'সাদা লোক আসবার বছর।'

এর পরেও পার্ক আর একবার দলবল নিয়ে আফ্রিকায় যান এবং সেইখানেই প্রাণ হারান। এবার গোড়াতেই জ্বর-জারি হয়ে তাঁর লোকজন সব মারা যেতে লাগল। সাতচল্লিশজন সাহেবের মধ্যে তিন মাসে কুড়ি জন মারা গেল, বাকী অনেকগুলি অসুখে একেবারে কাহিল হয়ে পড়ল। চার মাসে তিনি আবার নাইগার নদীর ধারে উপস্থিত হলেন। তখন তিনি আর সঙ্গে দুই একটি নিগ্রো ছাড়া আর সকলেই প্রায় অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে। তারপর তিনি নৌকায় চড়ে জলের পথে কয়েকদিন গেলেন, কিন্তু চারিদিক থেকে মূরেরা ক্রমাগত আক্রমণ করে তাঁদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। শেষটায় যখন তাঁর সঙ্গের সাতটি মাত্র সাহেব বেঁচে আছে, এমন সময় অনেক কষ্টে নিগ্রোদের দেশে এসে তিনি মনে করলেন, এতক্ষণে নিরাপদ হওয়া গেল। কিন্তু এই- খানেই নদী পার হবার সময় তিনি দলবলশুদ্ধ নিগ্রোদের হাতে মারা গেলেন। তাঁর একটিমাত্র বিশ্বস্ত নিগ্রো চাকর, তাঁর চিঠিপত্র নিয়ে ফিরে এসে এই খবর দিল যে, নদীর স্রোতের মধ্যে নৌকাকে বেকায়দায় পেয়ে নিগ্রোরা তাঁদের মেরে কেটে সব লুটে নিয়েছে। তখন পার্কের বয়স ৩৪ বৎসর মাত্র।

ডেভিড লিভিংস্টোন

স্কটল্যান্ডের এক গরীব তাঁতির ঘরে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ডেভিড লিভিংস্টোনের জন্ম হয়। খুব অল্প বয়স হতেই ডেভিড তার বাপের সঙ্গে কারখানায় কাজ করতে যেত, সেখানে তাকে প্রতিদিন চৌদ্দ ঘণ্টা খাটতে হত। কিন্তু তার উৎসাহ এমন আশ্চর্য রকমের ছিল যে, এত পরিশ্রমের পরেও সে রাত্রে একটা গবীব স্কুলে পড়তে যেত। যখনই একটু অবসর হত সে তার বই নিয়ে পড়ত, নাহয় মাঠে ঘাটে ঘুরে নানারকম পোকা মাকড় গাছ পাথর প্রভৃতি সংগ্রহ করে বেড়াত।

এমনি করে লিভিংস্টোনের বাল্যকাল কেটে গেল। তারপর উনিশ বৎসর বয়সে তাঁর মাহিনা বাড়তে, বাড়ির অবস্থা একটু ভাল হল। তখন তিনি কারখানার মালিকের সঙ্গে এমন বন্দোবস্ত করে নিলেন, যাতে তিনি বছরে ছয় মাস কাজ করতেন আর বাকী ছ'মাস গ্লাসগো সহরে গিয়ে পড়াশানো করতেন। সেখানে কয়েক বছর ডাক্তারি পড়ে এবং ধর্ম শিক্ষার পরীক্ষা পাশ করে, ২৭ বৎসর বয়সে তিনি অসভ্য জাতিদের মধ্যে শিক্ষা ও ধর্ম প্রচারের জন্য চাকুরি নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় গেলেন। আফ্রিকায় তখনও সাহেবরা বেশি যাতায়াত করেনি—ম্যাপের অনেক স্থানেই তখন অজানা দেশ বলে লেখা থাকত। সেই অজানা দেশে অচেনা লোকের মধ্যে লিভিংস্টোন বাস করতে গেলেন।

পাদ্রী ডাক্তার লিভিংস্টোন দেখতে দেখতে আফ্রিকার নানা ভাষা শিখে ফেললেন, সেখানকার লোকেদের সঙ্গে মিশে তাদের সুখ-দুঃখের কথা সব জানলেন—আর দেশটাকে তাঁর এত ভাল লাগল যে, তার সেবায় জীবনপাত করতে তিনি প্রস্তুত হলেন। সে দেশের লোকের বড় দুঃখ যে, দুষ্ট পর্তুগীজ আর আরব দস্যুরা তাদের ধরে নিয়ে দাস করে রাখে, ছাগল গরুর মতো হাটে বাজারে তাদের বিক্রি করে। বেচারীরা হাতীর দাঁত,

পাখির পালক ও নানারকম জন্তুর চামড়ার ব্যবসা করে, বিলাতী জাহাজে করে সওদাগরেরা তাদের জিনিস কিনে নিয়ে যায়। কিন্তু মাঝপথে এইসব দুষ্টু লোকেরা তাদের মারধর করে বেঁধে নিয়ে যায়। লিভিংস্টোন এইসব অত্যাচারের কথা শুনে একেবারে ক্ষেপে গেলেন। তিনি বললেন, যেমন করে হোক, এ অত্যাচার থামাতে হবে।

তিনি দেখলেন, ব্যবসা করতে হলে সেই লোকদের এমন সব পথ দিয়ে যেতে হয় যেখানে পর্তুগীজ আর আরবরা তাদের সহজেই ধরে ফেলতে পারে—সমুদ্রে যাওয়া আসার আর কোন সহজ রাস্তা তাদের জানা ছিল না। তাদের দেশে বাণিজ্যের কোন ভাল বন্দোবস্ত নাই। ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় লোকদের মধ্যে ব্যবসা চালাবার কোন সংযোগ নাই। লিভিংস্টোন তখন পথঘাটের সন্ধান করে পাহাড়ে জঙগলে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। বড় বড় নদীর পথ ধরে দিনের পর দিন চলে চলে, কত নতুন দেশ নতুন পাহাড় নতুন লোকের খবর পেলেন। এই কাজ তাঁর এত ভাল লাগল আর তাতে তাঁর এত উৎসাহ হল যে, তিনি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে, পাদ্রির কাজ ফেলে, এই কাজেই দিন রাত লেগে রইলেন।

ক্রমে তিনি বুঝতে পারলেন, আফ্রিকার এপার ওপার পূব- পশ্চিম যাওয়ার মতো পথ পাওয়া গেলে তবে বাণিজ্যের খুব সুবিধা হয়। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে এই রাস্তার খোঁজে তিনি কয়েকজন সে-দেশী লোকের সঙ্গে কালাহারি মরুভূমি পার হয়ে ক্রমাগত উত্তর-পশ্চিম মুখে ঘুরতে ঘুরতে, পাঁচ বছরে পর্তুগীজ রাজ্যে পশ্চিম সমুদ্রের উপকূলে এসে হাজির হলেন। পথের কষ্ট এবং জ্বরে ভুগে তাঁর শরীর তখন একেবারে ভেঙে গেছে, আর যেন নড়বার শক্তি নাই। কিন্তু তিনি সহজে থামবার লোক নন; কয়েক মাস বিশ্রাম করেই তিনি আবার ফিরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এবার তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, সেখান থেকে একেবারে পূর্বদিকে সমুদ্রের কল পর্যন্ত না গিয়ে তিনি থামবেন না।

জলের পথ দিয়ে নানা নদীর বাঁক ধরে ঘুরতে ঘুরতে, তিনি ক্রমে জাম্বেসি নদীতে এসে পড়লেন। তাঁর আগে আর কোন বিদেশী সে জায়গা দেখে নাই। সেখানকার লোকদের সঙ্গে তিনি আলাপ করে এক আশ্চর্য খবর শুনলেন। তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের দেশেও কি ধোঁয়ায় গর্জন করতে পারে ?' লিভিংস্টোন বললেন, 'সে কি রকম?' তারা বলল, 'তুমি ধোঁয়া-গর্জনের পাহাড় দেখনি?' লিভিংস্টোনের ভারি আগ্রহ হল, এ জিনিসটা

একবার দেখতে হবে। সেই জাম্বেসি নদী দিয়ে নৌকা করে তিনি অনেক দূর গিয়ে দেখলেন, এক জায়গায় ধোঁয়ার মতো পাঁচটা স্তম্ভ উঠেছে, তার চারদিকের দৃশ্য এত সুন্দর যে, লিভিংস্টোনের বোধ হল এমন চমৎকার স্থান তিনি আগে কখনও দেখেননি। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, নদীটা গেল কোথায় ? সামনে খালি চড়া আর পাহাড়: নদীর চিহ্নমাত্র নাই– আর পাহাড়ের ওদিকে খালি ধোঁয়া আর গর্জন। সেইখানে নৌকা বেঁধে লিভিংস্টোন হেঁটে দেখতে গেলেন ব্যাপারখানা কি? গিয়ে যা দেখলেন তাতে তাঁর বোধ হল যে তাঁর জন্ম সার্থক–তাঁর এত বৎসরের পরিশ্রম সার্থক। তিনি দেখলেন, নদীটা একটা পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে ঢুকে পাহাড়ের পেট কেটে তিনশ হাত খাড়া ঝরনার মতো ঝরে পড়ছে। এত বড় ঝরনা লিভিংস্টোন কোনদিন চক্ষে দেখেননি। পড়বার বেগে ঝরনার জল ভয়ানক শব্দে ধোঁয়ার মতো ছড়িয়ে প্রায় ২০০ হাত উঁচু হয়ে উঠছে—তার উপর সূর্যের আলো পড়ে চমৎকার রামধনুর ছটা বেরিয়েছে—আর সেই ঝাপসা ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে রংবেরঙের গাছপালা পাহাড় জল দেখা যাচ্ছে, ঠিক যেন ছিটের পর্দা।

এমনি করে কত আশ্চর্য আবিষ্কার করতে করতে লিভিংস্টোন একেবারে নূতন পথ দিয়ে দুই বছরে আফ্রিকার পূর্বকূলে এসে পড়লেন। তারপর দেশে ফিরে গিয়ে সকলের কাছে সম্মান লাভ করে, তিনি দলবল নিয়ে আবার সেই জাম্বেসি নদীর ধারে ফিরে গেলেন। এবারে তাঁর স্ত্রীও তাঁর সঙ্গে গেলেন আর ইংরাজ গভর্নমেন্ট তাঁকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে লাগলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তাঁর স্ত্রী মারা গেলেন, তারপর তাঁর সঙ্গের লোকজন অনেকেই ফিরে গেলেন। ক্রমে বিলাত থেকে খরচ আসাও বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু লিভিংস্টোন একাই নিজের খরচে ঘুরতে লাগলেন। এবার নূতন পথে তিনি উত্তর-পূর্ব মুখে বড় বড় হ্রদের দেশ দিয়ে, একেবারে ইজিপ্টের কাছে 'নায়াসাতে' এসে পড়লেন। তাঁর সঙ্গে সে-দেশী দু-চারটি লোক ছাড়া আর কেউ ছিল না—কিন্তু তারা তাঁকে এত ভালবাসত যে, ঘোর বিপদের মধ্যেও তাঁকে ছেড়ে যেতে রাজি হয়নি।

লিভিংস্টোন কি তাদের কম ভালবেসেছিলেন! সেই আধার দেশের লোকের দুঃখে তাঁর যে কি দুঃখ—তাঁর বইয়ের পাতায় পাতায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। পর্তুগীজদের অত্যাচারের বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর কথাগুলো যেন আগুন হয়ে উঠত। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ লেখা এই—'এই নির্জন দেশে বসে আমি এই মাত্র বলতে পারি, পৃথিবীর এই কলঙ্ক (দাস ব্যবসায়) যে মুছে দিতে পারবে—ভগবানের অজস্র আশীর্বাদে সে ধন্য হয়ে যাবে।'

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ৫০ বৎসর বয়সে তিনি শেষবার আফ্রিকায় ঘুরতে গিয়েছিলেন—তারপর আর দেশে ফেরেননি। এবার তিনি গোড়া হতেই নানারকম বিপদে পড়েছিলেন—তাঁর জন্য যে রসদ পাঠান হল কতক তাঁর কাছে পৌঁছলই না—বাকী সব চুরি হয়ে গেল। তারপর ক' বছর ধরে তাঁর আর কোন খবরই পাওয়া গেল না। ক্রমে দেশের লোক ব্যস্ত হয়ে উঠল, লিভিংস্টোনের কি হল জানবার জন্য চারিদিকে লেখালেখি চলতে লাগল। শেষটা স্ট্যানলি বলে একজন ওয়েলশ যুবক তার খবর আনতে আফ্রিকায় গেলেন। এত বড় মহাদেশের মধ্যে একজন লোককে আন্দাজে খুঁজে বার করা যে খুবই বাহাদুরির কাজ, তাতে আর সন্দেহ কি? স্ট্যানলি বছরখানেক ঘুরে তাঁর দেখা পেলেন বটে, কিন্তু তখন লিভিংস্টোনের মর-মর অবস্থা। তিনি এত রোগা আর দুর্বল হয়ে পড়েছেন যে, দেখলে চেনা যায় না। স্ট্যানলির সাহায্যে লিভিংস্টোন কতকটা সেরে উঠলেন এবং তাঁর সঙ্গে কিছুদিন ঘুরলেন, কিন্তু দেশে ফিরে যেতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, 'আমি এই দেশের নির্জন নিস্তব্ধ জঙ্গলের মধ্যেই এ জীবন শেষ করব।'

তারপর, বছরখানেক পরে একদিন লিভিংস্টোন তাঁর বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে বসলেন,—আর উঠলেন না। তাঁর লোকেরা তাঁকে ডাকতে এল, তখন দেখল যে তিনি সেই অবস্থাতেই মারা গেছেন। বিশ্বাসী চাকরেরা অসাধারণ কষ্ট স্বীকার করে পাহাড় জঙ্গল পার হয়ে, সমুদ্রের কূল পর্যন্ত তাঁর মৃতদেহ বয়ে এনে জাহাজে তুলে দিল। ইংলণ্ডে যাঁরা বীর, যাঁরা দেশের নেতা, যাঁদের কীর্তিতে দেশের গৌরব বাড়ে, তাঁদের কবর দেওয়া হয় 'ওয়েস্টমিনস্টার এবি'তে। সেই ওয়েস্টমিনস্টার এবিতে যদি যাও, সেখানে লিভিংস্টোনের সমাধি দেখতে পাবে।

কলম্বাস

চারশ বৎসর আগে ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে আসিতে হইলে সকলেই পূর্বমুখে পারস্যের ভিতর দিয়া আসিত। তখন পণ্ডিতেরা সবেমাত্র পৃথিবীটাকে গোল বলিয়া বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ক্রিস্টোফার কলম্বস নামে ইটালি দেশীয় এক নাবিক ভাবিলেন, যদি সত্য সত্যই পৃথিবীটা গোল হয়, তবে ত পূর্বে মুখে না গিয়া ক্রমাগত পশ্চিম মুখে গেলেও, সেই ভারতবর্ষের কাছাকাছিই কোথাও পৌঁছান যাইবে। এ-বিষয়ে তাঁহার বিশ্বাস এতদূর হইয়াছিল যে, তিনি ইহা প্রমাণ করিবার জন্য আপনার প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু কেবল বিশ্বাস আর সাহস থাকিলেই হয় না—কলম্বস গরীব লোক, তিনি জাহাজ পাইবেন কোথা, লোকজন জোগাড় করিবেন কিসের ভরসায় ? তিনি দেশে দেশে ধনীলোকদের কাছে দরখাস্ত করিয়া ফিরিতে ফিরিতে পর্তুগালে আসিয়া হাজির হইলেন। ক্রমে তাঁহার মতলবের কথা রাজার কানে গিয়া পৌঁছিল–তিনি তাঁর মন্ত্রীদের উপর এই বিষয়ে তদন্ত করিবার ভার দিলেন। মন্ত্রীরা ভাবিল, 'এ লোকটার কথা যদি সত্য হয়, তবে খামখা এই বিদেশীকে সাহায্য না করিয়া, আমরাই একবার এ চেষ্টাটা করিয়া দেখি না কেন?' তাঁহারা কলম্বসের কাছে তাহার হিসাবশুদ্ধ সমস্ত নকশা চাহিয়া লইলেন, এবং গোপনে কয়েকজন পর্তুগীজ নাবিককে সেই পশ্চিমের পথে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু কিছু দূরে না যাইতেই ঝড় তুফান আর কেবল অকূল সমুদ্র দেখিয়া তাহারা ভয়ে ফিরিয়া আসিল। কলম্বস যখন জানিতে পারিলেন যে, রাজকর্মচারীরা তাঁহাকে এইভাবে ঠকাইতে চেষ্টা করিতেছেন, তখন রাগে ও ঘৃণায় তিনি সে দেশ ত্যাগ করিয়া স্পেন রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেইখানে সাত বৎসর রাজদরবারে দরখাস্ত বহিয়া, তারপর রাণী ইসাবেলার কৃপায় তিনি তাঁহার এতদিনের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার সংযোগ পাইলেন। ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ ঠিক ৪২৫ বৎসর পূর্বে কলম্বস ভারতবর্ষের সন্ধানে যাত্রা করেন।